সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব

১৯২১ সালের মে মাসের কোন এক সময়ে ঢাকায় প্রথম এলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আর তারপর থেকে পুরনো ঢাকা আর রইলো না শুধু ইতিহাসের পাতায়, উঠে এল বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আঙিনায়। ঐ বৎসরই কলকাতার এক প্রভাবশালী মহলের প্রবল বিরোধিতার মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ঈশ্বর মিল লেনের এক প্রতিভাবান তরুণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকের পদে ইস্তফা দিয়ে হিজল-তমালের দেশে, শাপলা-শালুক আর কৃষ্ণচূড়ার মাঝে মুগ্ধবিস্ময়ে এসে উপস্থিত হলেন।

এর আগে জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ভাইস চ্যান্সেলর পি.জে. হার্টগকে লেখা এক চিঠিতে সত্যেন বসু 'পরীক্ষণ অথবা গানিতিক পদার্থবিজ্ঞানে রিডার হিসেবে ঢাকায় আসার সম্মতি জানিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ পত্রে ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর মৌলিক প্রবন্ধের' তালিকা তিনি দিয়েছিলেন এইভাবে,

'(১) অন দি স্ট্রেস ইকুয়েশন অব ইকুইলিব্রিয়াম—বুলেটিন, ক্যালকাটা মাথ্যামেটিকাল সোসাইটি।

(২) অন দি হেরপরহোড— ঐ।

(৩) অন দি ইকুয়েশন অব স্টেট— ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন।

(৪) ডিডাকশান অব রিডবার্গ ল' ফ্রম দি কোয়ান্টাম থিওরি— ঐ।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর গভর্নর রোনাল্ডশে ৮ ফেব্রুয়ারি মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে রিডার হিসেবে সত্যেন বসুর নিয়োগ অনুমোদন করেন। একই আদেশপত্রে ঢাকা কলেজের ডব্লিউ.এ. জেনকিনসকে অনুল্লিখিত বেতনে পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর এবং মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে আইনের প্রফেসর নিয়োগ করা হয়। ইতিপূর্বে জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে জেনকিনস রিডার পদের জন্য সত্যেন বসুকে সুপারিশ করে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। জেনকিনস হার্টগকে লিখছেন,'আমি আবেদনপত্রগুলি দেখেছি এবং যাঁদের পদার্থবিজ্ঞানের রিডার হিসেবে নির্বাচন করা যায় তাঁদের গবেষণাকর্ম যত্নের সঙ্গে পড়েছি। আমার মতে সবচেয়ে ভাল নিয়োগ হবে এস.এন. বোস অথবা মেঘনাদ সাহা। উভয় প্রার্থীই শক্তিশালী এবং মৌলিক গবেষক। যদিও সাহা বসুর চাইতে বেশি এবং অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করেছেন, তবু ফিল. ম্যাগ.-এ বসুর শেষ প্রবন্ধটি তাঁকে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল বলে প্রমাণ করে। সাহা যেসব সুযোগ পেয়েছেন বসু এ পর্যন্ত তা পাননি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দাবিকেই সমর্থন করতে আগ্রহী। বসুর সম্বন্ধে আমি যা জানি এবং শুনেছি তা থেকে বলতে পারি যে, তিনি উৎসাহের সঙ্গে এবং অন্যদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করবেন। আমার মনে হয় তাঁকে আনার চেষ্টা করা উচিত।'

সত্যেন বসু এ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত এবং পদার্থবিদ্যার প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্যার আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করে তাঁর ঢাকায় আসার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন এবং ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে তিনি হার্টগকে জানান যে, 'জুন অথবা তার আগেই' তিনি ঢাকা পৌছে যাবেন।

সুতরাং বলা যায় যে, ১৯২১ সালের ১ জুন আন্তরিক আগ্রহ নিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের রিডার পদে যোগদান করেছিলেন। প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম। সত্যেন বসু পড়াতেন তাপ-বলবিদ্যা এবং ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব। আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়েও তিনি পড়াশোনা করতেন এবং ঐ সময়কার পদার্থবিজ্ঞানের মূল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই কল্পনা করুন দুই বৎসর পরে তাঁর 'খুশিহীন বিস্ময়' না 'আনপ্লেজেন্ট সারপ্রাইজ', যখন বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ তাঁকে জানালেন যে, 'মাসিক ৫০০ টাকা স্থির বেতনে দুই বৎসরের' জন্য তাঁকে পুনর্নিয়োগ করা হল। সত্যেন বসু সঙ্গত কারণেই অভিমানভরে পি.জে. হার্টগকে লিখলেন,

'যদি দুই বৎসর নিরলস এবং বিবেকসম্পন্ন প্রয়োসের স্বীকৃতি এইভাবে আপনার বিশ্বদ্যিালয় দেয়, তবে আমার মনে হয় কারো পক্ষে বোঝা কষ্টকর হবে না বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে।'

এ ধরনের স্বীকৃতি অবশ্য ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে এটাই প্রথম নয় এবং শেষও নয়। তবু ভাইস চ্যান্সেলর তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এই বলে,

'বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে সকল শিক্ষককে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল অথবা যাঁদের নিয়োগ এই বৎসরে শেষ হবে তাঁদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের নিয়োগ ১৯২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এবং আপনিও সেইভাবে চিঠি পেয়েছেন।'

কিন্তু সত্যেন বসুকে এভাবে চিঠি দেয়া যায় না। হার্টগ যাই লিখুন, সত্যেন বসুর প্রতিভা তাঁর অজানা ছিল না। তাই ১৯২৩ সালের ৯ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি কমিটি গঠন করেন, মি. এস. এন. বসুর সাক্ষাৎ নেয়ার জন্য যাতে তিনি কি কি শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে রাজি হবেন তা নির্ধারণ করা যায়। কমিটিতে ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর পি.জে. হার্টগ, প্রফেসর জে.সি. ঘোষ এবং পি.কে. ঘোষ বার-এট-ল'। পরে প্রফেসর জেনকিনসকেও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে এই কমিটি 'বসু কমিটি' নামে পরিচিত।

'বসু কমিটি'র ঐতিহিাসিক মূল্য এই যে, খুব সম্ভব এই সময়েই বসু পরিসংখ্যান সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নিজের ওপর অগাধ আস্থা ছিল বলেই সত্যেন বসু ১৯২৩ সালের ২৭ আগস্ট 'বসু কমিটি'র কাছে আবেদন করেন যে তাঁকে '১৯২৪ সালের সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে দুই বৎসরের শিক্ষা-ছুটি' আর ১২,৫০০ টাকা ঋণ দেয়া হোক। হার্টগ এবং জেনকিনস দু'জনেই তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছেন। তাই ১৯২৩ সালের ১ ডিসেম্বর তাঁকে রিডার হিসেবে পুনর্নিয়োগ করা হয় মাসিক ৬৫০ টাকা বেতনে যা ১৯২৪ সালের ১ জুলাই সর্বোচ্চ ৭০০ টাকায় পৌছবে।

এদিকে 'বসু কমিটি' বেশ কয়েকবার মিলিত হন— জেনকিনস-এর টেনিস ক্রীড়াসূচি এবং পি.কে. ঘোষের কোর্ট-উপস্থিতির কর্মসূচি ইত্যাদি অসুবিধা সত্ত্বেও। ১৯২৪ সালের ২ মার্চ কমটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সত্যেন বসুকে দুই বৎসরের শিক্ষা-ছুটি দেয়া যেতে পারে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। এজন্য তাঁকে ১৩,৮০০ টাকা ঋণ দেয়া হবে,

'...যদি সরকার বর্তমান বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অনুদান দেন।'

অতিরিক্ত অনুদান পাওয়া গিয়েছিল কিনা জানা যায়নি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯২৪ সালের ৯ আগস্টের সভায় সত্যেন বসুর জন্য '১৯২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর বা তার কাছাকাছি সময় থেকে শুরু করে ১৯২৬ সালের ৩ আগস্ট পর্যন্ত দুই বৎসরের শিক্ষা ছুটি' মঞ্জুর করেন।

আসলে 'বসু কমিটি' এবং কার্যনির্বাহী পষিদের বিচার-বিবেচনা স্বচ্ছ এবং ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে ছোট্ট একটি চিঠি। হাতে লেখা চিঠি সাধারণ কাগজে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পদের এটি একটি।

প্রিয় সহকর্মী,

আমি আপনার প্রবন্ধটি ভাষান্তর করেছি এবং সাইটশ্রিফট ফ্যুর ফিজিকে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান বলে মনে হয় এবং

বাংলাইন্টারনেট.কম

আমাকে তা খুশি করেছে। আমার কাজ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য আমি সম্পূর্ণ সঠিক মনে করি না। কেননা ভিনের সরণ সূত্রের জন্য তরঙ্গতত্ত্বের অনুমান প্রয়োজন হয় না এবং বোরের নীতিও মোটেই ব্যবহার করতে হয় না। তবে নিশ্চয়ই সেজন্য কিছু আসে যায় না। আপনিই প্রথম উৎপাদকটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে নির্ধারণ করেছেন যদিও সমবর্তন উৎপাদক ২ সম্বন্ধে যুক্তি অতটা জোরালো নয়। এটি বাস্তবিকই একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

বন্ধুসুলভ অভিবাদনান্তে,

আপনার

এ. আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের এই চিঠির ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন বসুকে শিক্ষা-ঋণ এবং শিক্ষা-ছুটি দিয়েছিল এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভাইস চ্যান্সেলর ইংল্যান্ডে রাদারফোর্ড আর ব্র্যাগকেও চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের গবেষণাগারে সত্যেন বসুকে কাজ করার সুবিধা দিতে কিন্তু সেখানে তখন স্থান ছিল না এবং তাই সে যাত্রায় সত্যেন বসুর ইংল্যান্ড যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ইউরোপের পথে সত্যেন বসু বোম্বাই পৌছান ১৯২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর (ছিলেন ব্যালার্ডপিয়ের হোটলে) এবং প্যারিস পৌছান অক্টোবরের ১৮ তারিখে (প্যারিসের ঠিকানা ছিল ১৭ রু দ্য সমেরার্ড)।

সত্যেন বসু ইউরোপে কি করেছিলেন তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই বলা যায়। ১৯২৫ সালের ২২ জানুয়ারি তারিখে তিনি প্যারিস থেকে ভাইস চ্যান্সেলরকে লেখেন,

'এই বছরের প্রথম থেকে কুরি গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ আমাকে দেয়া হয়েছে। কলেজ দ্য ফ্রাঁসের প্রয়েসর লাঞ্জেভাঁর বক্তৃতা শুনতে আমি উপস্থিত থাকি। তিনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছেন এবং আপেক্ষিক তত্ত্বের একটি গাণিতিক সমস্যার ওপর আমাকে কাজ কতে বলেছেন।'

তারিখবিহীন আর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন,

'বর্তমানে আমি এম. দ্য ব্রগলির রঞ্জনরশ্মি গবেষণাগারে কাজ করছি। আগামী বছরের শুরু থেকে রেডিয়াম ইন্সটিটিউটে কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে বলে মাদাম কুরি আমাকে আশা দিয়েছেন।'

আসলে কলেজ দ্য ফ্রাঁসের প্রফেসর সিলভাঁ লেভি প্রয়েসর রাঞ্জেভাঁর সঙ্গে সত্যেন বসুর পরিচয় করে দেন 'যা থেকে বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজ করার এই সব সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।'

সত্যেন বসুর কাছে 'ইউরোপীয় শীতের প্রথম অভিজ্ঞতা মোটেই অস্বাচ্ছন্দ্যজনক ছিল না। তিনি তাঁর ইউরোপ প্রবাসকে ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন, যদিও প্রথমদিকে তাঁর ইচ্ছা ছিল ইংল্যান্ড যাওয়া। পরিকল্পনা পরিবর্তনের কারণ জানা যায় না। তবে রাদারফোর্ড তাঁর গবেষণাগারে স্থানাভাবের কথা বলেছিলেন। ১৯২৪ সালের ২০ নভেম্বরের একটি চিঠিতে হার্টগ রাদারফোর্ডকে লিখছেন, 'আপনার জায়গার ওপর চাপের ব্যাপার আমি ভালভাবেই বুঝি।'

এদিকে ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে পদার্থবিজ্ঞানের একটি অধ্যাপক পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে। প্রার্থীদের ভারতীয় অথবা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ওপর উচ্চ ডিগ্রি থাকতে হবে এবং যাঁদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে ও যাঁরা গবেষণাকর্মে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

ইউরোপ থেকে সত্যেন বসু ঐ পদের জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁর আবেদনপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি আমার জন্ম। ম্যাট্রিকুলেশনের পর আমি কলকাতার প্রেসডেন্সি করেজে পড়াশোনা করি এবং ১৯১৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ফলিত গণিত বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করি। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে প্রভাষক হিসেবে কাজ করি এবং ১৯২১ সাল থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রিডার হিসেবে কর্মরত।

তাঁর সম্বন্ধে পরিচিতিমূলক সুপারিশ দেয়ার জন্য তিনি যাঁদের নাম করেন তাঁরা হলেন প্রফেসর এ. আইনস্টাইন, প্রফেসর পল লাঞ্জেভাঁ এবং ড. হেরমান মার্ক। তিনি তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের নিম্নলিখিত তালিকা পাঠিয়েছিলেন,

(১) অন দি ইনফ্লুয়েন্স অব ফাইনাইট ভলিউম অন দি ইকুয়েশন অব স্টেট, (বসু ও সাহা), ফিল. ম্যাগ. ১৯১৮ আগস্ট।

(২) রিডবার্গ ল ফ্রম কোয়ান্টাম থিওরি, ফিল. ম্যাগ. ১৯২০, ৬১৯।

(৩) ইনটিগ্রেশন অব স্ট্রেস ইকুয়েশন ক্যাল. ম্যাথ. সোসা. বুল.।

(৪) অন দি হেরপোলহোড, ক্যাল. ম্যাথ. সোসা. বুল।

(৫) প্ল্যাংকস গেসেৎস উভ লিখট কোয়ান্টেন হিপোথিসে, জেড ফ্যুর ফিজ ১৯২৪।

(৬) ভের্মেগ্লাইখগেভিক্ট ইন স্ট্রাহলেন ফেল্ড, জেড ফ্যুর ফিজ. ১৯২৪।

এই নতুন তালিকা থেকে একথা স্পষ্ট যে বসুর বিখ্যাত প্রবন্ধটি (৫নং) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়েই রচিত হয়েছিল— কলতাকায় নয়। ভারি কণা সম্পর্কে ৬নং প্রবন্ধটিও আইনস্টাইন ভাষান্তর করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

১৯২৬ সালের ১৬ মার্চ আইনস্টাইন তাঁর সুপারিশ পাঠান,

'এ পর্যন্ত এস. এন. বোসের গবেষণাসমূহ, বিশেষকরে তাঁর আলোক এবং ভরসম্পন্ন বস্তুকণার তত্ত্ব, আমার মতে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী অবদান। বসুর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের পর আমার এই ধারণা হয়েছে যে, তিনি সেই রকম একজন মানুষ, যার কাছ থেকে বিজ্ঞান আরও অনেক কিছু আশা করে...।

প্যারিস থেকে লাঞ্জেভাঁ লেখেন (২০.৪.১৯২৬),

'...সত্যেন্দ্রেনাথ বসু আমার অধীনে এক বৎসর ১৯২৪-২৫ প্যারিসে কাজ করেছেন। বসুর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করি।"

বার্লিন থেকে হেরমান মার্ক দীর্ঘ চিঠিতে লেখেন (২.৫.১৯২৬),

'.... সম্প্রতি কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউটে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পদার্থবিজ্ঞানের একটি গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন যা রঞ্জনরশ্মি সংক্রান্ত... ।'

কলেজ দ্য ফ্রান্স থেকে সিলভাঁ লেভি লেখেন (১০.৫.১৯২৬),

"আমি পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ওপর মত প্রকাশের যোগ্যতা রাখি না, কিন্তু এখানে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। আমি নিজে বলতে পারি এস. এন. বোস আমার পরিচিতের মধ্যে একজন অত্যন্ত উঁচুদরের বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব—তাঁর মন আশ্চর্যজনকভাবে উন্মুক্ত, উজ্জ্বল, সক্রিয় এবং বহুমুখী। আমার চেনা-জানা অত্যন্ত স্নেহপরায়ন ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম এবং আমি নিশ্চিত যে, তিনি তাঁর ছাত্রদের ওপর গভীর এবং ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন।'

সিলভাঁ লেভির প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ বরে প্রমাণিত হয়েছে।

তবে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের বিজ্ঞাপিত অধ্যাপক পদটির জন্য আরো একজন প্রার্থী ছিলেন। তিনি হলেন কলকাতার ড. ডি. এম. বসু। বার্লিনে তিনি বহুকাল কাটিয়েছেন এবং চৌম্বকত্বের ওপর গবেষণায় যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

অদ্যাপক-নির্বাচনী কমিটির বিশেষজ্ঞ ছিলেন কোয়ান্টাম-বলব্যিার বিখ্যাত শিক্ষক মিউনিখের আর্নল্ড সমারফেল্ড। ১৯২৬ সালের ৩১ আগস্ট সমারফেল্ড নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠান,

'উভয় প্রার্থী অত্যন্ত যোগ্য; এস.এন. বোস বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী; ডি. এম. বোস প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষণবিদ এবং তত্ত্ববিজ্ঞানী; সম্ভবত শেষোক্তজনকে পছন্দ করা যায়।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের মতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন যা দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল আর করা হয় না— এমনকি 'বোস চেয়ারে' নিয়োগের ক্ষেত্রেও না। ১৯২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রফেসরের পদটি ডি.এম. বসুকেই প্রদান করেন এবং এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন যে, 'ড.ডি.এম. বসু যোগদান না করলে মি. এস. এন. বসুকে' পদটি দেয়া হবে।

এইরোপ থেকে ফিরে এসে সত্যেন বসু রিডার হিসেবে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯২৬ সালের ৩১ সেপ্টেম্বর এবং ডি.এম. বসু ঢাকায় আসার অপারগতা জানালে সত্যেন বসুকে প্রফেসর এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান নিয়োগ করা হয় ১৯২৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি।

পরের বৎসর ১৯২৮ সালে আর্নল্ড সমারফেল্ড ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সত্যেন বসুর উদ্যোগে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানায় ঢাকায় আসার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালোরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তাঁর ১৪ দিন নষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আর ঢাকায় আসতে পারেননি। সমারফেল্ডের বিশেষ অনুরোধে সত্যেন বসু কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে সত্যেন বসু পদার্থবিজ্ঞান বিভাগটিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছিলেন। সে সময়ে রঞ্জনরশ্মির কেলাস তত্ত্ব, রামন-প্রক্রিয়া, চুম্বকত্ব, বর্ণালী প্রতিপ্রভা, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মৌলিক গবেষণা তিনিই এই বিভাগে শুরু করেছিলেন। প্রায় দুই দশক তাঁর উদ্যোগে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং এই বিভাগের এটাই ছিল স্বর্ণযুগ। তারপর নেমে আসে পাকিস্তানি আমলের অন্ধকার।

১৯২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন বসুকে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে পুনর্নিয়োগ দান করেন 'সেই শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত যখন তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে উপনীত হবেন।' ১৯৪৫ সালে সত্যেন বসুর বয়স ৫১ বৎসরের হলে অবসর গ্রহণের পরও তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখার জন্য কিছু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু চিরাচরিত ক্লেদাক্ত রাজনৈতিক আবাহাওয়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। এ সময়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে খয়রা প্রফেসরের পদটি গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। ১৯৪৫ সালের ২ জুলাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দেন যে, 'তিনি ইতিমধ্যেই কলকাতার প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' এ বৎসরই কোন এক সময়ে তিনি চিরদিনের জন্য ঢাকা পরিত্যাগ করে চলে যান। কলকাতা থেকে তারিখহীন একটি এক লাইনের পত্রে সত্যেন বসু ১৯৪৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর এবং ঢাকা হলের প্রভোস্ট পদে ইস্তফা দেন। এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসুর ২৪ বৎসরের কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু কি আশ্চর্য গৌরবময় এই চব্বিশটি বছর।

১৯৭৪ সালে আমি সত্যেন বসুকে কলকাতার রাজভবনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ম্যাক্স প্ল্যাংকের বিকিরণ সূত্র নির্ধারণে যে যৌক্তিক অসঙ্গতি ছিল সে সম্বন্ধে এত পরিষ্কার ধারণা আপনি কি করে করেছিলেন?' তিনি তাঁর অনবদ্য স্মিত হাসি হেসে বলেছিলেন, 'আমি তোদের ওখানে বিকিরণ তত্ত্ব পড়াতাম যে, রে।'

এই সময়কার যুগসন্ধিক্ষণ বুঝতে হলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে পদার্থবিজ্ঞানে একটা চরম অস্বস্তিজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে অনেক পরীক্ষণলব্ধ তথ্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল না। যেমন কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা একটি আবদ্ধ বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিকিরণ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেই বিকিরণের মধ্যে সব স্পন্দন সংখ্যাই থাকবে এবং প্রতিটি স্পন্দন সংখ্যার সঙ্গে জড়িত শক্তির পরিমাণও পরীক্ষা করে মাপা সম্ভব। স্পন্দন সংখ্যা অনুসারে বিকিরণ শক্তির বণ্টন একটা বিশেষ ধরনের হয়— প্রথমে তা শূন্য থেকে উঠতে শুরু করে, তারপর তার একটা সর্বোচ্চ চূড়া থাকে এবং তারপর আবার তা ধীরে ধীরে শূন্যে নেমে আসে। এই সুন্দর প্রকৃতি কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের চিরায়ত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা সেখানে দাবি করা হয় যে, বিকিরণের স্পন্দন সংখ্যা যত বাড়বে তার শক্তিও তত বৃদ্ধি পাবে। অবশ্যই এটা একটা অবস্তব ব্যাপার কেননা তাহলে সমগ্র বিশ্ব এক সময় অতি উচ্চ শক্তির বিকিরণ দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যেত, যার ফলে প্রাণের অস্তিত্বই থাকতে পারত না।

ম্যাক্স প্ল্যাংক এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের রক্ষা করেছিলেন একটা অনুপ্রাণিত অনুমানের সাহায্যে। তিনি একটা পরীক্ষণভিত্তিক সমীকরণ আন্দাজ করেছিলেন যা দিয়ে

বিকিরণের শক্তিবণ্টন সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু শুধু সমীকরণটি আন্দাজ করেই তিনি চুপ করে বসে ছিলেন না। ঐ সমীকরণের ভিত্তি খোঁজার কাজেও তিনি ব্যাপৃত হলেন এবং দেখলেন যে, সমীকরণটি নির্ধারণ করা যায় যদি বিকিরণকে কণা দিয়ে তৈরি বলে কল্পনা করা হয়।

এ পর্যন্ত ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে যে, বিকিরণ হল একটা অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ কিন্তু এখন প্ল্যাংকের সমীকরণ দাবি করছে যে, বিকিরণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (বিচ্ছিন্ন) কণা হিসেবেও চিন্তা করা দরকার। আলো শুধু যে তরঙ্গ বলে আমরা এত দিন জেনে এসেছি সেটাই সব নয়। আলো ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি এটাও এখন স্বীকার করে নিতে হবে। এসব কণাকে বলে ফোটন বা আলোক কণা এবং প্রতিটি ফোটন হল একটি কোয়ান্টাম বা শক্তিগুচ্ছ যা স্পন্দন সংখ্যার গুণিতক। এভাবেই জন্মগ্রহণ করল বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

প্ল্যাংক বাধ্য হয়ে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ধারণার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এলেন, কিন্তু তিনি নিজেও প্রথমদিকে বুঝতে পারেননি যে, তাঁর বিপ্লব কতটা ব্যাপক। এটা বুঝতে পেরেছিলেন সর্বপ্রথম আইনস্টাইন এবং তিনিই প্রথম কোয়ান্টাম ধারণা সর্বব্যাপকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু প্ল্যাংকের সমীকরণ নির্ধারণে যে একটা ত্রুটি ছিল, এটা অনেকেরই চোখে পড়েনি।

সত্যেন বসুর চোখে এই ত্রুটি ধরা পড়ে। ত্রুটিটি হল এই যে, প্ল্যাংকের সমীকরণে দুটি অংশ আছে। এক অংশে রয়েছে বিকিরণের শক্তি। এই অংশ নির্ধারণের জন্য প্ল্যাংক অনুমান করেছিলেন যে, বিকিরণ হল বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তা শক্তিগুচ্ছের সমাহার। কিন্তু দ্বিতীয় অংশে একটি আবদ্ধ বস্তুর অভ্যন্তরে সঠিক বা স্থির স্পন্দনের সংখ্যা গণনা করা হয়। এবং এই গণনার সময় ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব ব্যবহার করা হয় যেখানে বলা হয় যে, বিকিরণ তরঙ্গ-প্রকৃতির অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং প্ল্যাংকের সমীকরণ একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি, যার মধ্যে এক অংশে রয়েছে কণা বা ফোটনের ধারণা এবং অন্য অংশে রয়েছে তরঙ্গের বা স্থির স্পন্দনের ধারণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিকিরণ তত্ত্ব পড়াবার সময় সত্যেন বসুর চোখে এই যৌক্তিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

এক অনুপ্রাণিত অনুমানের সাহায্যে সত্যেন বসু এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি ধরে নিলেন যে, এই আলোকণাগুলি সব একই ধরনের। অর্থাৎ তারা সব অদৃশ্য, তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। এটাও চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের পরিপন্থী ধারণা, কেননা এত দিন আমরা জেনে এসেছি যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সব বস্তুকণা বিভিন্ন— তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। সত্যেন বসু ধারণা করলেন যে, কোয়ান্টাম জগতে এই পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণ আর সম্ভব নয় এবং এখানে তাঁর ধারণাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সত্যেন বসুর আর একটি অনুপ্রাণিত অনুমান ছিল যে, কোয়ান্টাম বস্তুকণার দশাজগতের ক্ষুদ্রতম আয়তন শূন্য হতে পারে না। কোয়ান্টাম কণার ক্ষুদ্রতম দশা-আয়তন হল প্ল্যাংকের ধ্রুবকের ত্রিঘাত। আমরা আজকাল জানি যে, হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যতার নীতি আসলে একথাই বলে, কিন্তু সত্যেন বসুর সময় তা জানা ছিল না। সত্যেন বসুর কাছে এটা ছিল একটা অসমসাহসিক অনুমান।

সত্যেন বসু আরো একটা অনুমান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বলেছেলেন যে, ফোটন কণার দুটি মাত্র সমবর্তন দশা আছে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে তিনি কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। আসলে ভরহীন বস্তুকণার জন্যে দলতত্ত্বের ব্যবহার ছাড়া এটা ব্যাখ্যা করা যায়ও না এবং অনেক দিন পরে ভিগনার সার্থকভাবে দলতত্ত্ব দিয়ে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

প্ল্যাংকের সমীকরণ নির্ধারণের জন্যে সত্যেন বসুর প্রয়োজন হয়েছিল একটা কোয়ান্টাম অবস্থার তাপীয় সম্ভাবনা গণনা করা। তাঁকে ১৯৭৪ সালে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি এত কম্বিনেট্রিক্স কোথায় শিখেছিলেন?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি গণিতের ছাত্র ছিলাম এবং প্রশান্ত মহলানবীশের কাছে অনেক কিছু শিখেছিলাম।'

সত্যেন বসু তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি প্রথমে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জার্নাল ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে পাঠান, কিন্তু ছয় মাস পর তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। ঐ ম্যাগাজিনের রেফারি তাঁর প্রবন্ধের মূলকথা ধরতেই পারেননি বলে মনে হয়। কিন্তু নিরাশ না হয়ে সত্যেন বসু ১৯২৪ সালের জুন মাসে প্রবন্ধটি আইনস্টাইনের কাছে পাঠান এবং লেখেন, 'আপনি দেখবেন যে প্ল্যাংকের সমীকরণের উৎপাদকটি আমি চিরায়ত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব ব্যবহার না করে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছি। শুধু অনুমান করেছি যে, দশাজগতের ক্ষুদ্রতম অংশ হল প্ল্যাংক ধ্রুবকের ত্রিঘাত।' ঐ সময়ে পৃথিবীতে বোধ হয় আইনস্টাইনই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর কাছে সত্যেন বসুর এই অনুমানের তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হতে পারত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধটি অনুবাদ করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং একথাও প্রবন্ধের শেষে লিখেছিলেন যে, বসুর নির্ধারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এবং তিনি নিজে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ভারি বস্তুকণার দশাসমীকরণ কি পাওয়া যায় তা দেখাবেন। এভাবেই জন্ম নেয় বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব।

এটা অবশ্য ঠিক যে, সত্যেন বসু নিজে তাঁর পদ্ধতির গুরুত্ব বোঝেননি। বহুদিন পরে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার ধারণাই ছিল না যে আমি যা করেছি তা নতুন কিছু।' ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে বসুর দেখা হয়। আইনস্টাইন ঐ সময় হাইসেনবার্গ, শ্রয়ডিঞ্জার, ডিরাকের আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন। আইনস্টাইন সত্যেন বসুকে এই নতুন বলবিজ্ঞান ব্যবহার করে বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্বের 'প্রকৃত অর্থ' আবিষ্কার করতে বলেন। সত্যেন বসু অবশ্য একাজ করতে পারেননি। ডিরাক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দিয়ে এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করেন। সমাধান এই যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তরঙ্গ-অপেক্ষক হল একটি কোয়ান্টাম দশার সম্ভাবনা, বিস্তার। সুতরাং তা প্রতিসাম্যের অথবা বিপরীত প্রতিসাম্যের হতে পারে। অর্থাৎ দুটো বস্তুকণা যারা বসুর ধারণা অনুসারে সদৃশ— তাদের মধ্যে বদলাবদলি করা হলে তরঙ্গ-অপেক্ষক একই থাকতে পারে অথবা একটি বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে গুণ হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে তরঙ্গ-অপেক্ষক হল প্রতিসাম্যের এবং যেসব বস্তুকণার জন্য

প্রতিসাম্যের তরঙ্গ অপেক্ষক ব্যবহার করতে হয়, বসুর নাম অনুসারে তাদের বলে বসু কণা বা বোসন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তরঙ্গ অপেক্ষক হল বিপরীত প্রতিসাম্যের এবং যেসব বস্তুকণার জন্য এই ধরনের তরঙ্গ-অপেক্ষক ব্যবহার করতে হয়, ফার্মির নামানুসারে তাদের বলা হয় ফার্মিয়ন। এভাবেই সত্যেন বসুর নাম চিরকালের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সত্যেন বসু জীবনের সব কিছু যে সহজে পেয়েছিলেন, তা নয়। যদিও তিনি ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এসসি. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন এবং পরে বি.এসসি. (সম্মান) এবং এম.এসসি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন তবুও তিনি কোন চাকরি সঙ্গে সঙ্গেই পাননি। তিনি এক বছর প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে জীবনধারণ করেন এবং তারপরে পাটনা কলেজে একটি চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন, কিন্তু তাঁকে বলা হয় যে, তারা একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এসসি. খুঁজছেন। এরপর তিনি আলীপুরের আবহাওয়া দফতরে চেষ্টা করেন, কিন্তু 'বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্রের জন্য সেখানে কোন চাকরি খালি ছিল না।

১৯১৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে প্রভাষক নিযুক্ত হন, কিন্তু এ সময়ে কোন পরীক্ষায় একটি ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নের জন্য সব ছাত্রকে পুরো মার্কস দেয়ার দাবি করলে তিনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনেন, কেননা প্রশ্নকর্তা ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। বোধ হয় এ কারণেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য দরখাস্ত করলে আশু মুখুজ্জে কোন আপত্তি করেননি।

নতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত আবহাওয়া সত্যেন বসুর ব্যক্তিক্রমী প্রতিভা স্ফুরণের পক্ষে নিঃসন্দেহে উপযুক্ত ছিল। তিনি আইনস্টাইনের কাছে তাঁর প্রবন্ধ পাঠাবার কিছু দিন পরেই ইউরোপ যান এবং ১৯২৪-২৫ এই দুই বছর প্যারিসে কাটান। এ সময় তিনি পি লাঞ্জেভাঁ, মাদাম কুরি মরিস এবং লুই দ্য ব্রগলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁর লাজুক প্রকৃতি তাঁকে এদের সঙ্গে একত্রে গবেষণা করতে দেয়নি। তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন কিন্তু আইনস্টাইন তত দিনে বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্বের ওপর যা কিছু করার শেষ করে তাঁর একীভূত তত্ত্বের কাজে ফিরে গিয়েছেন। তাই বসুর স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি।

ঢাকায় ফিরে সত্যেন বসু পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক পদে ব্রতি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এর আগে বা এর পরে আর কখনো এত উঁচুতে ওঠেনি। কিন্তু, তবু ১৯৪৫ সালে বসু বিশ্বদ্যিালয়ের চিরাচরিত অভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হন। মোটে ৫১ বছর বয়সে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিতে হয়।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ছিলেন। তারপর দু'বছর তিনি বিশ্বভারতীর ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং ১৯৫৯ সালে তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করেন।

১৯৫৪ সালে সত্যেন বসু ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৫৮ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। যদিও এই সম্মান তাঁর অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল। ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সত্যেন বসু তাঁর অশীতিতম জন্মদিবসের কয়েক দিন পরেই লোকান্তরিত হন।

যদিও পদার্থবিজ্ঞান, গণিত এবং সংখ্যাতত্ত্বে গবেষণা সত্যেন বসুর প্রধান আকর্ষণ ছিল, তবু তিন সারাজীবন সাহিত্য, ইতিহাস এবং সঙ্গীতচর্চা করে গিয়েছেন। তিনি এস্রাজ বাজাতে পছন্দ করতেন যেমন তাঁর গুরু আইনস্টাইন বাজাতেন বেহালা। ছাত্রাবস্থায় সত্যেন বসু স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং প্যারিসে থাকাকালে ইউরোপে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের তিনি একজন উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থটি সত্যেন বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদান সম্ভব হবে কি?' তাঁর উত্তর ছিল, 'যাঁরা বলেন যে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া যায় না, তাঁরা হয় এই ভাষা জানেন না অথবা তাঁরা বিজ্ঞান জানেন না।'

এটাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রেখে যাওয়া আমাদের সত্যেন বসুর অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য।

বাংলাইন্টারনেট.কম